শিক্ষক ডিরোজিওর ষোলো কলা

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

ডেভিড ড্রামন্ডকে বলেছি 'কলকাতার আদি আচার্য'[১], আর ডিরোজিওকে আখ্যায়িত করেছি 'রুটিন-ভাঙা এক মাস্টার'[২] নামে। বাঁকা মাস্টারের সিধে ছাত্র। ডিরোজিওর জীবনীকার লিখেছেন,

> David Drummond, the grim Scottish, hunch-backed school master, and Henry Derozio, the sprightly, clean-limbed, brilliant Eurasian boy, admired and loved each other as rarely master and pupil do.[৩]

'মেকার অব ডিরোজিও' ড্রামন্ডকে নিয়ে আস্ত একটা বই লেখা হয়েছে, রুটিন-ভাঙা মাস্টার ডিরোজিওকে নিয়েও। এরপর শিক্ষক ডিরোজিওকে নিয়ে অন্তত আমার লেখার কিছু আছে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান ছিলাম। অনেক সময় ঘুরে-আসা তীর্থে স্বজনের অনুরোধে তার সঙ্গী হতে হয় এই আশায় পুণ্যটা যদি আর-একটু গাঢ় করা যায়। সেই সুযুক্তি খাড়া করে 'দুর্গা, দুর্গা' বলে রওনা দেওয়া গেল।

অকরুণ জীবন দেবতা যাঁর জন্য বরাদ্দ করেছিলেন মাত্র ২২ বছর ৮ মাস ৮ দিনের এক আয়ুষ্কাল, আর হিন্দু কলেজে যিনি মাত্র বছর পাঁচেক[৪] সময় পেয়েছিলেন শিক্ষকতা করার তাকে নিয়ে কি এত আলোচনা করার আছে? সেই প্রশ্নের উত্তরটাই আমরা এখানে ধরবার চেষ্টা করবো।

জিওন-কাঠির নামই মাস্টার

জ্ঞানের অফুরন্ত আধার তো বই। বই পড়লেই যেখানে জ্ঞানের তৃষ্ণা মিটে যায়, সেখানে মাস্টার লাগে কেন? লাগে এই জন্য—বই অক্ষরের ইঁট দিয়ে সাজানো জ্ঞানের ইঁটপাঁজা মাত্র। বাড়ির মূল উপাদান সেখানে থাকে-থাকে সাজানো আছে ঠিকই, কিন্তু বাড়িটা নেই। বাড়িটা তৈরি করে দেন মাস্টার। ছাত্র একটি মানবিক অস্তিত্ব। তার মননকে, তার গ্রহিষ্ণু হৃদয়কে সঞ্জীবিত করার জন্য লাগে আর একটি সজীব, সপ্রাণ, উন্নতমনা সত্তা। নিষ্প্রাণ গ্রন্থ তাই যথেষ্ট নয়, একটি জিওন-কাঠির দরকার হয়। সেই জিওন-কাঠির নামই মাস্টার। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের ব্যবস্থা বৈগুণ্যে অধিকাংশ মাস্টারই পোড়া-কাঠির সামিল। তারা জানেই না ঠিক কোনখানে আছে ছাত্রদের ভিতর থেকে খুলে যাওয়ার রহস্য। ডিরোজিও জানতেন, পারতেন এবং পেরেছেন। ফলে ৬০ বা ৬৫ বছর পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হয়নি, ৫ বছরেই তিনি শত শত ৬৫ বছরের কাজ সেরে নিয়েছিলেন।

শিষ্য বোবা, গুরু কালা

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মানচিত্রে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক-বিন্যাসটা সাধারণত এইরকম—ছাত্র জানে না আর মাস্টার অনেক জানে। ছাত্র শূন্যকুম্ভের মতো হাঁ করে থাকবে আর মাস্টার তাঁর পূর্ণ কুম্ভ থেকে জ্ঞানের বারি ঢেলে দেবেন। ছাত্রের কান আছে

মুখ নেই, আর মাস্টারের মুখ আছে কান নেই। বোবা কালার এই যান্ত্রিক সম্পর্কে বাঁধা ছাত্র ও শিক্ষকের বা গৃহীতা ও দাতার সম্পর্ক। ডিরোজিও এটাকে ভেঙে দিয়েছিলেন। একটা অভূতপূর্ব সমত্বের সম্পর্ক-বন্ধনে তিনি মিলেছিলেন ছাত্রদের সঙ্গে। ছাত্ররা মিলতে পেরেছিল তাঁর সঙ্গে। দূরত্ব-নির্দিষ্ট বিপরীতের নিয়তিকে অতিক্রম করা তো সহজ কথা নয়। কি করে, কোন্ গুণে ডিরোজিও সম্পন্ন করেছিলেন সেই দুরূহ কাজটি, তা আমরা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করব এই নিবন্ধে।

প্রায় সমবয়সী

॥ এক ॥ বয়স। মাস্টারের সঙ্গে ছাত্রের দূরত্বের একটা চাক্ষুষ বা শারীরিক দিক হচ্ছে বয়স। ডিরোজিও যখন হিন্দু কলেজে যোগ দেন তখন তাঁর বয়স সাকুল্যে ১৭। ছাত্রদের বয়স ১৩/১৪/১৫-র মধ্যে। কেউ কেউ তাঁর সমবয়সী। হরচন্দ্র ঘোষ তো তার চেয়ে এক বছরের বড়ই ছিলেন। এতে ছাত্ররা ছিলেন খুশির মেজাজে। মাস্টারের সঙ্গে সখ্য পাতানোর এই বয়সগত নৈকট্য হামেশা মেলে না। তারুণ্যে টগবগ করা মাস্টারের সঙ্গে উঠতি বয়সের ছেলেরা মিলতে পেরেছিলেন বান্ধব নৈকট্যে। কিন্তু মাস্টার বন্ধু হয়ে গেলে মাস্টারেরই পতন হয়, ছাত্রের উন্নয়ন নাও হতে পারে। সেজন্য মাস্টারের মধ্যে এমন মহার্ঘ গুণাবলী সংহত হওয়া দরকার, যার আলো নিয়ত ঠিকরে পড়বে ছাত্রদের মুখে ও মনে। সে সব গুণাবলী ডিরোজিওর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। সে সব কথা পরে।

বিলিতি সাহেব নন

॥ দুই ॥ ডিরোজিওর সঙ্গে ছাত্রদের সমত্বের বা সমানুভবের আর-একটা অবকাশ ছিল। সেটা সামাজিক। ডিরোজিও খাঁটি সাহেব (ইউরোপিয়ান) ছিলেন না। তিনি বিলেত থেকে আসেন নি। এখানেই জন্ম তাঁর। তিনি ছিলেন ইউরেশিয়ান বা ইস্ট-ইন্ডিয়ান সমাজের মানুষ। অর্থাৎ মিশ্র জাতির মানুষ। ইস্ট-ইন্ডিয়ানরা তখন ব্রিটিশ শাসনে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি-বাকরি, আইনগত ও সাংবিধানিক অধিকারের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন অবদমিত ও হতাশা পীড়িত অবস্থায়।[৫] এজন্য ইস্ট ইন্ডিয়ান সমাজকে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যেতে হয়। ডিরোজিও সেই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। কলকাতার সামাজিক মানচিত্র তখন ত্রিধা বিভক্ত—একদিকে হোয়াইট ক্যালকাটা (চৌরঙ্গি এলাকা), অন্যদিকে ব্ল্যাক ক্যালকাটা (উত্তর কলকাতা) আর মাঝখানে মিক্সড্ ক্যালকাটা। ডিরোজিও মিক্সড ক্যালকাটার বাসিন্দা। অবদমিত সমাজের সংবেদনশীল মানুষ হিসাবে পরাধীন 'নেটিভ' সমাজের দিকেই বাড়ানো ছিল তাঁর পা এবং মাথা। হিন্দু কলেজের শিক্ষক হিসাবে তিনি দেশীয় ছাত্রদের স্বজন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। শ্বেতাঙ্গ সুলভ কোনো বিলিতি অহমিকা দেশি ছাত্রদের সঙ্গে অসেতুসম্ভব দূরত্ব রচনা করেনি।

পশ্চিমী বিদ্যার অগ্নিবিগ্রহ

॥ তিন ॥ হিন্দু কলেজ যাঁরা গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই হিন্দু সমাজপতিরা বুঝেছিলেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইংরেজি ভাষা ও বিদ্যা রপ্ত করতে না পারলে সমাজ পরিস্থিতির উপর তাঁদের বংশলোচনদের প্রভুত্ব থাকবে না। সেইজন্যেই

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা। প্রবীণ সমাজপতিরা পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে যদি এক কদম এগিয়ে থাকেন, তাঁদের বংশলোচনরা এগিয়েছিলেন তিন কদম। অগ্নিবুভুক্ষু পতঙ্গের মতো তারা ধাবিত হতে চেয়েছিলেন পশ্চিমী বিদ্যার দিকে। ডিরোজিও ছিলেন পশ্চিমী বিদ্যার অগ্নিবিগ্রহ। ফলে আগ্রহ ও তৃষ্ণার তীব্রতা তাদের সম্পর্ককে অতিনিকট, সংসক্তিময় ও অবলীল করেছিল। পতঙ্গ তো তাপের তীব্রতা, দহনের জ্বালা কিছুই মানে না। তো সেই ব্যাপারই ঘটেছিল ডিরোজিওর ছাত্রদের ক্ষেত্রে।

আদি গঙ্গায় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস

॥ চার ॥ কে ডিরোজিও? উনিশ শতকের তর্কসঙ্কুল বঙ্গীয় নবজাগরণে কি কাজ এই তরুণ শিক্ষকের? বঙ্গীয় নবজাগৃতির মূলসূত্র ছিল দুটি—এক, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিগ্রহণ, দুই, প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার পুনরুদ্ধার। প্রথমটির দায়ভার কার্যকরীভাবে গ্রহণ করেছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> বিশ্বের জ্ঞানজগৎ থেকে ভারতবর্ষ একঘরে হয়ে আছে, তাকে শিক্ষার ছিটে-ফোঁটা দিয়ে চিরকেলে পাঠশালার পোড়ো করে রাখা হয়েছে। আমরা পৃথিবীর জ্ঞানধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত অবমাননা থেকে মুক্তি পেতে চাই।[৬]

ডিরোজিও যেটা করেছিলেন সেটা হচ্ছে 'শিক্ষার ছিটে-ফোঁটা দিয়ে চিরকেলে পাঠশালার পোড়ো' করে রাখা হয়েছিল যাদের, তাদের তিনি 'পৃথিবীর জ্ঞানধারার সঙ্গে যুক্ত' করে দিয়েছিলেন। এটা একটা ঐতিহাসিক কর্তব্য। শিক্ষক ডিরোজিওর মূল কাজ। মজে যাওয়া আদি গঙ্গায় তিনি এনে দিলেন সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। এমতাবস্থায় ছাত্ররা দড়াদড়ি ছিঁড়ে অকূল সমুদ্রে ভেসে যেতে চাইবে সেটাই স্বাভাবিক। এবং তা-ই হয়েছিল।

মুক্তির মেশায়া

॥ পাঁচ ॥ নতুন জেগে ওঠা প্রাণ ভেঙে ফেলতে চায় সমস্ত 'ট্যাবু'। শিশু যেমন জুতোর ফিতেও পরম আগ্রহে চেখে দেখে। অনেক 'না' দিয়ে বাঁধা একটা সমাজ। প্রতি পদে নিষেধ। বাড়িতে নিষেধ, বাইরে নিষেধ; শাস্ত্রে নিষেধ, অ-শাস্ত্রে নিষেধ।

> কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
> চারিদিকে তার বাঁধন কেন।
> ভাঙ্ রে হৃদয়, ভাঙ্ রে বাঁধন,
> সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন,
> লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া
> আঘাতের 'পরে আঘাত কর্
> মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ
> কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ![৭]

ডিরোজিও নিষেধকে নাকচ করার কথা বললেন। অতি বিশ্বাসের দড়াদড়ি দিয়ে বাঁধা হাতে তুলে দিলেন যুক্তির ছুরি। বললেন, রুটিন মানতে হবে না, সিলেবাস মানতে হবে না, ঘন্টা মানতে হবে না, শ্রেণীকক্ষও মানতে হবে না। স্কুল শুরুর আগে এসো; ছুটির পরেও থাকো। 'Conversazione'-এর সভা আছে।[৮] শুধু ৪র্থ শ্রেণী নয়, ৩য়, ২য়, ১ম, এমনকি

যে ছাত্র নয়, সেও আসতে পারো। পাঠ্যক্রমের বই পড়ে কিছু হবে না। এই নাও টম পেইন, হিউম, লক, বেকন, টমাস মূর, ক্যাম্পবেল, বার্ণস। পাঠ্যগ্রন্থের সীমানা ছিঁড়ে বেরোও। শাস্ত্রে যা করা বারণ, কলেজের নিয়মাবলীতে অনুমোদিত নয়, শাসনতন্ত্রে বেআইনি—প্রশ্ন করো। সবকিছুকে নিয়ে এসো 'at the bar of reason'।[৯] কলেজে নিষেধাজ্ঞা তো কি হয়েছে? বাড়িতে এসো। পটলডাঙা ইস্কুলে যাও। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতে মিলিত হও মঙ্গলবার মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। ছাত্ররা পাগল হয়ে গেল। অনাস্বাদিত দর্শন, বাধা বাঁধনহীন জীবনচর্যা। মুসলমান রুটির দোকান, খ্রিস্টান মাস্টার কোনো ভেদাভেদ নেই। মুক্তি! মুক্তি! ডিরোজিও তাদের চোখে দেখা দিলেন মুক্তির মেশায়া হয়ে। মুক্তির এই ছাড়পত্র আগে কেউ ছাত্রদের এমনভাবে দেয়নি। না অভিভাবক, না শাস্ত্রকর্তা, না মাস্টার। এক মহোৎসবের আবহ স্কুলে, গোটা কলকাতা জুড়ে। ডিরোজিও শুধুমাত্র সিলেবাসকেন্দ্রিক জ্ঞান বিতরণের জলযন্ত্র হয়ে রইলেন না, তিনি হয়ে উঠলেন নীরস, নিরুদ্ধ, বিশুষ্ক বোশেখের পর নেমে আসা আষাঢ়ের ধারা শ্রাবণ।

> আমার পরাণ যাহা চায়/তুমি তাই, তুমি তাই গো।[১০]

সোনালি রোদের আলো

॥ ছয় ॥ কি রকম মানুষ ডিরোজিও? খুব রাশ ভারি! প্রত্যাখ্যানময়? বেত্রহস্ত? আপন জ্ঞানের সমুদ্রে তরঙ্গবেষ্টিত দুর্গম দ্বীপের মতো? আদৌ না।

> All was sunshine him. As a teacher, he won the affection of his pupils. Never was he known to speak rudely to them. If he wished any of them to keep out of his ways, his usual language was, 'My dear boy, you are not transparent.'[১১]

ক্রোধের মেঘ কখনো তাঁর কপালে ছায়া ফেলতো না। সূর্য করোজ্জ্বল মুখ, খোলা জানালার মতো উন্মুক্ত। তর্জনী আর ভ্রূকুটি শাসিত পৃথিবীতে এমন মানুষকে উঠতি বয়সের ছাত্ররা যে পছন্দ করবে—এটা খুবই স্বাভাবিক।

যে মাস্টার ছাত্রকে জিতিয়ে দেয়

॥ সাত ॥ আমি যা বলেছি সেটাই শেষ কথা, সবচেয়ে সঠিক কথা। অভিভাবক ও শিক্ষকেরা এই 'infallible' ইমেজটাই খাড়া করতে চান। ডিরোজিও মনে করতেন, 'This is fraught with mischief and should be discouraged'।[১২] শুধু মনে করতেন না, কাজেও দেখিয়েছেন। ১৮২৯ সালের ১৯ অক্টোবর তিনি এক ছাত্রের বক্তব্য নস্যাৎ করে পরে বুঝতে পারেন ছাত্রটিই ঠিক। তিনি ভুল করেছেন। তারপর তিনি কি করলেন তাঁর কথাতেই শুনুন—

> It appeared afterwards that I am mistaken; and I confessed my indescretion before the whole class।[১৩]

ছাত্রটিকে একপাশে ডেকে চুপি চুপি নয়, সারা ক্লাসের ছাত্রদের সামনে স্বীকার করলেন তাঁরই ভুল হয়েছিল। ছাত্রের অনুভূতি ও সম্মানকে 'hurt' বা 'wound' করা নয়, 'I gave

the boy an opportunity to triumph'।[১২] যে মাস্টার ছাত্রকে হারিয়ে তার শক্তি ও শৌর্য কায়েম করে সে নয়, যে মাস্টার ছাত্রকে জিতিয়ে দেয় ডিরোজিও ছিলেন সেই মাস্টার। এ মাস্টার সত্যি সুদুর্লভ।

গোঁজ নয়, শস্য বীজ

॥ আট ॥ সাধারণত শিক্ষকেরা ছাত্রদের উপর তাঁর নিজস্ব জ্ঞান, ধারণা, দর্শন বা বোধ আরোপ করে দেন। তিনি যেহেতু উঁচু পর্যায়ের মানুষ, তাঁর অজ্ঞাত কিছু নেই। তিনি সেটা করতেই পারেন। এ কাজের অধিকারী তিনি। এইজন্যই তো তিনি মাস্টার হয়েছেন। ডিরোজিও শিক্ষকতা করতেন আরোপ-পদ্ধতিতে নয়, অঙ্কুরণ-পদ্ধতিতে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, গোঁজ বাইরে থেকে যত গভীর করে পুঁতে দেওয়া হোক না কেন তা গোঁজই থেকে যায়। কিন্তু শস্য বীজ পুঁতলে তা থেকে অঙ্কুরিত হয় নতুন গাছ। ছাত্রদের মধ্যে নিহিত সম্ভাবনাকে উপযুক্ত কর্ষণের মধ্যে দিয়ে অঙ্কুরিত করাই যথার্থ শিক্ষকের কাজ। বিবেকানন্দ বলতেন, 'Education is the manifestation of the perfection already in man।'[১৩] ডিরোজিও এই কাজটাই করেছেন। এর প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে। ছাত্রদের হাতে বই তুলে দিয়েছেন, বলেছেন পড়ো; লেখনী তুলে দিয়েছেন, বলেছেন লেখো; বক্তৃতা ও বিতর্কের মঞ্চে তুলে বলেছেন, বলো কি বলার আছে। লিখন সংস্কৃতি ও বাক্ সংস্কৃতির এতাদৃশ নিবিড় কর্ষণ এদেশে অভূতপূর্ব। মালী যেমন করে বীজ পোঁতে, মাটি কোপায়, জল দেয়, অঙ্কুরিত গাছে ফুল ফোটায়, তাকে ফলবান করে—ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের নিয়ে নিবিড় নিষ্ঠায় সেই কাজই করে গেছেন। তিনি ছাত্রদের নিয়ে একটি বাগান বানিয়েছিলেন। সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাগানটির নাম 'ইয়ং বেঙ্গল'। শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে ডিরোজিওর শিষ্যমণ্ডলী নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বারে বারেই বলেছেন, 'এটি ডিরোজিও বৃক্ষের উৎকৃষ্ট ফল।'[১৪]

রীতিমতো স্পোর্টসম্যান

॥ নয় ॥ ডিরোজিওর জীবনীকাররা লিখেছেন, তিনি ক্রিকেট খেলতেন ময়দানে 'on autumn evenings on the maidan';[১৫] গ্রীষ্মের সকালে বামনবস্তি পুকুরে সাঁতার কাটতেন (swam and sported together in early summer mornings in the Bamon Bustee, the great tank);[১৫] আর তেজি আরব ঘোড়ায় চড়তেন (spurred and booted to the knee, on a powerful Arab)।[১৬] —এসব বক্তব্য যদি সঠিক হয় তবে বলা যেতে পারে ডিরোজিও রীতিমতো 'স্পোর্টসম্যান' ছিলেন। এইখান থেকে ছাত্রদের ডিরোজিও প্রীতির একটা অদম্য রহস্যসূত্র পাওয়া যেতে পারে। 'স্পোর্টসম্যান'দের ছেলেরা পছন্দ করে বেশি। স্কুলে এখনও দেখা যায় স্পোর্টসের টিচার ভীষণ প্রিয় ছাত্রদের।

শিক্ষকতাও একরকম শিল্প

॥ দশ ॥ ছাত্রাবস্থা থেকেই ডিরোজিও ভালো 'পারফরমার'। অসামান্য আবৃত্তি করতেন, প্রশংসনীয় অভিনয় করতে পারতেন। মাত্র ৮ বছর বয়সে ডিরোজিও ড্রামণ্ডের স্কুলে গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন কিজন্য জানেন? 'ক্যালকাটা গেজেটে' বের হয়েছিল সেই সংবাদ—

> Henry Derozio—First in Recitation.[১৭]

এটা ১৮১৭ সালের সংবাদ। ১৮২১ সালে 'ক্যালকাটা জার্নাল' লিখলো,

> H. Derozio in the 'New Castle Apothecary' and the Tent Scene in 'Richard-III' shewed great versatility of powers highly cultivated for so young a man.[১৮]

১৮২২ সালে হাস্যরসাত্মক অভিনয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখান তিনি। শাইলকের ভূমিকায়ও অভিনয় করেন। এবং 'Colman's humorous vagary of the Poetical Apothecary was recited also by DEROZIO and with capitally indicrons effect.'[১৯]

১৮২৪ সাল। ড্রামন্ডের স্কুলে 'ডগলাস' নাট্যাভিনয়ের প্রারম্ভে ডিরোজিও স্বরচিত 'প্রোলোগ' পাঠ করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিলেন। জনগ্রান্ট লিখলেন, অসামান্য উচ্চারণ 'His very correct accent was extra-ordinary'।[২০] শুধু আবৃত্তি নয়। নাটক আরম্ভ হলো। ডিরোজিও অভিনয় করছেন গ্লিনালভনের চরিত্রে। খুদে নায়িকা র‍্যানডলফের সঙ্গে রোমান্টিক অভিনয়ে ডিরোজিও মুগ্ধ করে দিলেন দর্শকদের।

> Even this prologue by a boy in his fifteen year exhibited no mean indication of talent. He was the Gleanalvon of the evening. His conception of the part was good and his execution spirited.[২০]

—এসব কথা এত করে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আবৃত্তি শিল্পের কাজ হচ্ছে সুস্পষ্ট উচ্চারণে প্রতিটি শব্দকে ভাবার্থ অনুযায়ী সজীব ও প্রাণবন্ত রূপে উপস্থাপিত করা। শিক্ষকতা তো বাক্-নির্ভর শিল্প। শব্দ দিয়ে গাঁথা কথার জাদু দিয়েই ছাত্রদের মন্ত্রমুগ্ধ করতে হয়। আবাল্য আবৃত্তিকার ডিরোজিও যে সেটা ভালোই পারতেন তাতে সন্দেহ কী?

অভিনেতা কি করেন? অভিমুখে নয়তি যঃ সঃ। যতদূর সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে ডিরোজিও শাইলকের মতো ক্রূর চরিত্রে, কোলম্যানের কৌতুকময় চরিত্রে, হত্যার অপরাধবোধে ভৌতিক আতঙ্কগ্রস্ত তৃতীয় রিচার্ডের চরিত্রে, গ্লিনালভনের রোমান্টিক ও কলহপরায়ণ চরিত্রে শ্রুতি-মুখ্য অভিনয় করে নাম কুড়িয়েছিলেন। সংস্কৃত মতে অভিনয়ের তিনটি দিক থাকে। আঙ্গিক, আহার্য ও বাচিক। আহার্য মানে সাজসজ্জা। সেটি বাদ দিলে থাকে উচ্চারণ শিল্প ও অঙ্গচালনার ক্রিয়া। একটা বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় রূপে উপস্থাপিত করার জন্য উচ্চারণ ক্রিয়ার সঙ্গে মিশে যায় চোখ, মুখ, হাত, দেহ চালনার সূক্ষ্ম ভঙ্গিমাগুলি। নাট্যশিল্প যার অধিগত তার কথা বলা ও চালচলন আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক। তিনি দর্শক ও শ্রোতাদের অভিমুখে নিজেকে, নিজের বক্তব্যকে অত্যন্ত সচেতন ও শিল্পিতরূপে উপস্থাপিত করেন। অভিনেতার রম্য গুণাবলী আয়ত্তে থাকলে শিক্ষকতা অন্য মাত্রা পায়। এই বৈশিষ্ট্য ডিরোজিওর গুরু ড্রামন্ডের ছিল। তাঁর জীবনীকার বার্ষিক পরীক্ষা উৎসবে তাঁর সজীব উপস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

> He was the life and the soul of the assembly. All eyes were bent on him.[২১]

তাঁর কোমল এবং নমনীয়, তারুণ্যে ঝলমল করা নীল চোখ দুটি টেনে নিত সকলের দৃষ্টি। তার উদাত্ত কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ত কক্ষের এ মাথা থেকে ও মাথা। ডিরোজিওতে পৌঁছেছিল এর সুযোগ্য উত্তরসূরিত্ব।

তৃতীয় কাব্যের নাম 'ইয়ংবেঙ্গল'

॥ এগারো ॥ ডিরোজিও শিক্ষক এবং কবি। মানবতাবাদী রোমান্টিক কবি। স্বপ্নময়, অশ্রু-নির্ঝরিত, আদর্শ-উদ্দীপিত। শৌর্যের জয়গানে, মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়, আশার বর্ণিল আলাপনে খচিত তাঁর কবিতার পৃথিবী। মনের নানান বাতায়ন খুলে কবিরা দেখেন জীবনের নানা দিগন্ত। ছাত্রেরা কে কোন্ ভাবরসে অভিসিঞ্চিত হবে তার তো কোনো সঠিক ইশারা নেই। সপ্তবর্ণ আলোর তুলি কবির হাতে। নানান রঙের বাটি সাজানো তাঁর হৃদয়ের অলিন্দে। যে যে রঙে খুশি বর্ণিত হতে পারে। মনোভঙ্গি অনুযায়ী নানাজনের প্রাপ্তির নানা আয়োজন ডিরোজিওর হৃদয়-অলিন্দে।

১৮২৭ সালে বের হলো ডিরোজিওর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'Poems'। প্রশংসায়, সমালোচনায় কলকাতার কাগজ ছয়লাপ। ১৮২৮ সালে তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'The Fakeer of Jungheera and Other Poems'। ডিরোজিওর সুখ্যাতি কলকাতা ছাপিয়ে লণ্ডনে পৌঁছুল। ছাত্রদের কানে সবই আসছে। কবি খ্যাতি, সে তো দেবদুর্লভ ব্যাপার। কিন্তু একেবারে অসম্ভব কী! ছাত্ররা কবিতা লেখা মক্স করতে শুরু করে দিয়েছেন বার্ষিক পরীক্ষা-উৎসবেই টের পাওয়া যাচ্ছিল। কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১৮৩০ সালে বের করে ফেললেন 'The Shair and other Poems' (১ সেপ্টেম্বর ১৮৩০, ৩নং স্কট অ্যান্ড কোম্পানি, ইন্ডিয়া গেজেট প্রেস)।[২২] বাঙালির ছেলে ইংরেজিতে পদ্য লিখেছে। হৈ হৈ পড়ে গেল। হরচন্দ্র ঘোষও কবিতা লিখেছেন।[২৩] আরো কে কে কবিযশোপ্রার্থী হতে চেয়েছিলেন সে আর আজ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে যার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্ররা কবিতার পথে পা বাড়াচ্ছিলেন, স্বয়ং ডিরোজিও কিন্তু ক্রমশ গুটিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। ১৮২৮-এর পর তিনি আর কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন নি। একেবারে লিখতেন না তা নয়। কিন্তু স্রোত মন্দীভূত হয়ে গিয়েছিল। কবিতা যাঁর রক্তে, তার পক্ষে কবিতা লেখা ছেড়ে দেওয়া শক্ত। ডিরোজিও-ও ছাড়েন নি। অতঃপর তিনি তাঁর কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন কাগজের পৃষ্ঠায় নয়, দেশীয় ছাত্রদের মননে ও হৃদয়ে। তাঁর তৃতীয় কাব্যের নাম 'ইয়ং বেঙ্গল'। ১৮২৯ সালে 'ক্যালাইডোস্কোপ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'Sonnet to the Pupils of Hindoo College' কবিতাটি[২৪] পড়লে খানিকটা আন্দাজ করা যায় শিক্ষকতার মধ্যে দিয়ে তিনি আসলে পালন করেছিলেন মননঋদ্ধ কবিরই ব্রত। এ কবিতাটি তারই ভূমিকাপদ। কবিতার মধ্যে যে স্বপ্নসম্ভব সৃজনী শক্তি ক্রিয়াশীল থাকে, তা অর্শেছিল তাঁর ছাত্র নির্মাণ প্রকল্পে। আর ঠিক এই কারণে তিনি সকল মাস্টারের থেকে অন্যরকম। দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা হাত ধরাধরি করে এসে মিলেছিল তাঁর শিক্ষকতায়।

প্রভু আমার, প্রিয় আমার

॥ বারো ॥ বৈষ্ণব ভগবত সাধনায় আছে পঞ্চরসের কথা। মানবিক সম্পর্কের নানান সূত্র দিয়ে সে বাঁধতে চেয়েছে প্রেয়কে। ছাত্ররা ডিরোজিওকে কি চোখে দেখতো বা ডিরোজিও ছাত্রদের দেখতেন কিভাবে তার কিঞ্চিৎ হদিশ আছে ছাত্রদের লেখায় ও ডিরোজিওর লেখায়। ডিরোজিও শুধু মস্তিষ্ক নয়, স্পর্শ করেছিলেন ছাত্রদের হৃদয় ('to touch not only the head but the heart'),[২৫] সে কথা অনেকেই লিখেছেন। 'চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ

করে', তেমনি তিনি বালকদের আকর্ষণ করতেন।[২৬] লিখেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী। হিন্দু কলেজের করণিক হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'তাঁর নির্দেশ ও উপদেশ ছাড়া তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে এক পা-ও চলতে চাইতো না।'[২৭]

ভক্তিপূর্ণ মুগ্ধতায় ছাত্ররা যে মনে মনে তাঁর দাসানুদাস হয়ে পড়েছিল সে প্রমাণ মেলে। 'ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ/আরো কী তোমার চাই।'[২৮] ডিরোজিও ছিলেন ছাত্রদের প্রাণবায়ু স্বরূপ। তাঁর অকাল মৃত্যুতে খেদ প্রকাশ করে বিরুদ্ধবাদী পত্রিকা 'সংবাদ রত্নাকর' ছাত্রদের দুরবস্থা বর্ণনা করেছিল এই ভাষায়—

> এক্ষণে তাহারা বড় বিপদগ্রস্ত হইল কেননা তাহারদিগের জ্ঞান ছিল ড্রোজু হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ঐ অবোধেরা মাতাপিতার বাক্য হেলন করিয়াও ড্রোজুর আজ্ঞানুবর্তী হইয়াছিল ...ড্রোজুর মরণে তাহারা জীবন্মৃত প্রায় হইয়া থাকিবেক।[২৯]

পিতামাতার উপরে তাঁর স্থান। বিধাতাই তো। এই বিধাতার কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'প্রভু আমার, প্রিয় আমার।'[৩০]

ডিরোজিও কি চোখে দেখতেন ছাত্রদের? কোন্ ভাবদৃষ্টিতে?

> Expanding, like the petals of young flowers
> I watch the gentle opening of your infant minds.[৩১]

গাছ পুঁতেছিল যে সে যেমনভাবে দেখে প্রথম কুঁড়ির উন্মোচন, পক্ষীমাতা যেমন দেখে পক্ষীশাবকের প্রথম ডানা মেলবার চেষ্টা, সেইভাবে দেখছেন। এই দেখায় আছে মাতৃত্বের কোমলতা, বাৎসল্য রসের ঘন নিবিড় আবেশ। জননী যে তৃষ্ণা ও স্বপ্ন নিয়ে তার নবজাতক সন্তানের বিকচমান শৈশবের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেই কোমল মুগ্ধতা কবিতাটির প্রতি ছত্রে। যশস্বী সন্তানের স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে থাকেন জনক-জননী। তাদের সাফল্যেই তাঁর সাফল্য। 'And I feel I have not lived in vain.'[৩২]

শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য এবং মধুর রসের এক সূক্ষ্ম বিমিশ্রণ দিয়ে গাঁথা হয়েছিল ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক। তিনি বিধাতা, তিনি প্রভু, তিনি জননী, তিনি সখা, তিনি প্রিয়। ''তিনি স্কুলে পদার্পণ করিবামাত্র বালকগণ তাঁহার চারিদিক ঘিরিত। তিনি তাঁহাদিগের সহিত কথা বলিতে ভালোবাসিতেন। ...তিনি কেবল স্কুলের ছুটীর পর বালকদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া তৃপ্ত হইতেন না; তাহাদিগকে আপনার সহিত বাড়িতে যাইতে বলিতেন। সেখানে তাহাদিগের সহিত বয়স্যভাবে মিশিতেন।''[৩৩] শ্রদ্ধা এবং স্নেহের মধ্যে খেলতো মানব সম্পর্কের নানা রসরহস্য। নানা বিন্যাস দিয়ে তাঁদের সঙ্গে ডিরোজিওর সম্পর্ক বাঁধা ছিল। বহু তল ও বহু মাত্রাযুক্ত প্রিজমের মতো তাঁর চরিত্রে খেলতো নানা রঙের আলো। যিনি কবি, আবৃত্তিকার ও অভিনেতা তার ভিতরে ছিল কতরকম পর্দা ও রাগিনী। নানারকম সুরেই তিনি বেজে উঠতে পারতেন। জীবনীকার সঠিক কথাই লিখেছেন, 'ডিরোজিও ছাত্রদের মোহিত করে দিয়েছিলেন।'[৩৪] 'এরূপ অদ্ভুত আকর্ষণ, শিক্ষক ছাত্রে এরূপ সম্বন্ধ কেহ কখনও দেখে নাই।'[৩৫]

তীরেও নহে, পাড়েও নহে

॥ তেরো ॥ জীবন পথের পথিককে মাঝে মাঝেই গিয়ে দাঁড়াতে হয়, দু-মাথার মোড়ে যেখানে তাকে ঠিক করতে হয় কোন্ পথে তিনি যাবেন? যিনি 'গাইড'-এর দায়িত্ব

নিয়েছেন তার কাজ আরো সুকঠিন। কেননা ভুলের মাশুল সেখানে তাকে একা দিতে হয় না, অনুগামীদেরও দিতে হয়। সমাজের 'self-styled' হিতাকাঙ্ক্ষীরাও ছেড়ে কথা বলবেন না। তাদের হয়ে কেউ লিখবেন,

গুরু হয়ে উপদেশে, করিয়াছ গোঁড়া।
মিছে মতে আনিয়াছ, গোটা কত ছোঁড়া॥
তোমার হইয়া চেলা, গুরু যারা বলে।
তারা সেন এই মতে, আর নাহি চলে॥[৩৫]

তো ডিরোজিওকেও সেই সঙ্কটে পড়তে হয়েছিল। মাশুলও দিতে হয়েছিল। মাশুলের কথা থাক। বিচারের রায় ও রাজনৈতিক বন্দোবস্ত কদাচ সক্রেটিস বা যিশু খ্রিস্টের পক্ষে যায়। অভিযোগ উঠেছিল ডিরোজিও ছাত্রদের নাস্তিক করে দিচ্ছেন। আস্তিক্যবাদ ও নাস্তিক্যবাদের দ্বন্দ্বে ডিরোজিও নাকি শিখিয়েছিলেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাকচ করতে। এর জবাবে ডিরোজিও লেখেন, —ছাত্রদের তিনি কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শের দিকে ঠেলে দেন নি। আস্তিক্যবাদের সপক্ষে যে সব বক্তব্য আছে তার সঙ্গে নাস্তিক্যবাদের সপক্ষে যে সব বক্তব্য আছে—দু-রকম বক্তব্যের সঙ্গেই ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ছাত্ররা আস্তিক হবে না নাস্তিক হবে, সেটা তাদের ব্যাপার।

> আমার মনে হয়েছিল কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে হিউম-বর্ণিত ক্লিয়ানথেস ও ফিলোর কথোপকথনের সারমর্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া কর্তব্য। এই কথোপকথনের মধ্যে আস্তিকতার বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও পরিশীলিত যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়েছে। আমি তাদের কাছে হিউমের প্রত্যুত্তরে ড. রীড ও ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট (আস্তিকতার সপক্ষে) যে তীব্রতর কথাগুলি বলেছেন যা আজ পর্যন্ত কেউ খণ্ডন করতে পারেন নি— সেগুলোও উল্লেখ করেছি।... বিশ্বাস উৎপাদন করা আমার সাধ্যের মধ্যে পড়ে না। যদি কয়েকজনের নাস্তিকতার জন্য আমায় দায়ী করা হয় তবে অন্যদের আস্তিকতার জন্য প্রশংসাও আমার প্রাপ্য।[৩৬]

মতাদর্শ ও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে নিরপেক্ষতা মানবসভ্যতায় একটা শব্দ মাত্র। তার বেশি কিছু নয়। সেই 'নিরপেক্ষতা' রক্ষার দুরূহতম কঠিন পথ ডিরোজিও গ্রহণ করেছিলেন। এ শিক্ষক দ্বিতীয় হয় না।

আর একটি দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করি। সূক্ষ্ম সব মানবিক দ্বন্দ্ব নিয়ে ডিরোজিও ভাবিত ছিলেন। একদিকে আমাদের 'passions'—আবেগ তাড়িত প্রবৃত্তি, অন্যদিকে 'judgement'—মনন চালিত বিচারবোধ। কোনদিকে যাব আমরা? 'Maxims at Variance with Human Conduct' নামে লেখা ছোট্ট একটি লেখায় ব্যাপারটা তিনি খতিয়ে দেখতে চেয়েছেন।

> Why do the inclinations of the heart lead one way, and the judgements of the head another?[৩৭]

ছাত্রদের তৈরি করার দায়িত্ব যাঁর হাতে তাঁকে তো মুখোমুখি হতেই হবে এই 'passions' আর 'judgement, heart' আর 'head'-এর চিরন্তন এবং অনিবার্য দ্বৈততার সংকট।

আস্তিকতা ও নাস্তিকতার দ্বৈততা এবং হৃদয়মথিত আবেগ ও মনন পাতিত বিচার

বোধের সংকট কে মেটাবে? এই সংকটের দ্বৈততার মধ্যে মানুষ চিরকাল ছিল, থাকবে। ডিরোজিওর অবস্থানটাই এখানে লক্ষণীয়। তিনি তাঁর অবস্থান এমন একটা নিরপেক্ষ বিন্দুতে রেখেছেন, যেখান থেকে দুটোকেই দেখা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানী যেভাবে টেলিস্কোপিক নিরীক্ষায় মহাকাশস্থিত নক্ষত্রদের চিনিয়ে দেন, ডিরোজিও সেইভাবেই মানব-মহাকাশের সংকট নক্ষত্র-গুলিকে চিহ্নিত করেছেন। ছাত্রদের সৌভাগ্য যে এমন একজন মাস্টারের কাছে তাঁরা জীবনের পাঠ নেবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ক্রিটিক্যালম্যান, জেন্টলম্যান

॥ **চোদ্দ** ॥ রেনেসাঁসে দু-রকম মানুষ দেখা দিয়েছিলেন—'ক্রিটিক্যালম্যান' ও 'জেন্টলম্যান'। ইতালীয় রেনেসাঁসে 'ক্রিটিক্যালম্যান'-এর পরাকাষ্ঠা হচ্ছেন লরেঞ্জো ভাল্লা।[৩৮] 'ক্রিটিক্যালম্যান'-রা 'sharp eyes and bad tongue' নিয়ে পরিপার্শ্বের প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্নের ঝড় তোলে। আর 'জেন্টলম্যান'-এর পরাকাষ্ঠা ছিলেন বলদাসর কাস্তিলিয়নে[৩৯] পরিশীলিত, রুচিবোধ সম্পন্ন, সঙ্গীত বোদ্ধা, কাব্যরসিক, অধ্যয়নশীল, সহৃদয়, মননশীল, শান্ত, সুভদ্র মানুষ হবেন রেনেসাঁসের 'জেন্টলম্যান'। ছাত্রদের মনে যিনি অজস্র 'কেন'-র জড় তুলেছিলেন, তাকে 'ক্রিটিক্যালম্যান' ছাড়া কি বলা যায়? যুক্তি এবং তথ্যের এবং উপযোগিতার কষ্ঠিপাথরে সব কিছু কষে নিতে হবে। ডিরোজিওর প্ররোচনায় ইয়ংবেঙ্গলরা তাই করতে নেমেছিল। ডিরোজিওর ক্রিটিক্যাল সত্তার একটি প্রমাণ তুলে ধরি—'Cause and Effect'[৪০] নামক ছোট্ট একটি লেখায় ইহুদী ধর্মপ্রচারক রাব্বির একটি বক্তব্যকে বিচার করেছেন তিনি। রাব্বি লিখেছেন, 'যে স্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে সে আসলে বাড়িয়ে চলে ডাইনি, যে মহিলা ভৃত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করে সে বাড়িয়ে চলে অসতী মহিলা, আর যে পুরুষ-ভৃত্য বাড়ায় সে বাড়িয়ে চলে ডাকাতের সংখ্যা।' ডিরোজিও রাব্বির বক্তব্য নস্যাৎ করে লিখেছেন, সত্য নির্ণয়ের নামে আসলে লেখক 'much error'-এর জালে পাঠককে জড়িয়ে ফেলেছেন। 'I think our ideas concerning causes and their effect are very vague and inaccurate'।[৪০]

ডিরোজিও *শিল্পী : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়*

এই তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি তাঁকে বিখ্যাত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এতে বঙ্কিমের ভাষায় তিনি 'আধখানা মানুষ' হয়ে থেকে যেতেন, 'আস্ত মানুষ' হতে পারতেন না।[৪১] খতিয়ে

দেখলে বোঝা যায় তিনি শুধু 'ক্রিটিক্যালম্যান' নন, 'জেন্টলম্যান'ও ছিলেন। 'জেন্টল ম্যান'-এর যাবতীয় গুণাবলী তাঁর মধ্যে সংহত ছিল। জীবনীকার তাই দৃঢ় চিত্তে লিখেছেন,

> We confidently state that anger was never seen to could his brow. All was sunshine with him.[৪২]

তাঁর সুভদ্র ব্যক্তিত্বের দুটি উদাহরণ দেব। তাঁর উপর দু-দুবার আক্রমণ নেমে এসেছিল। এক, বিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা ; দুই, সাংবাদিকতা কালে তার অফিসে চড়াও হয়ে ক্যাপ্টেন ম্যাকনাটেন কর্তৃক দৈহিক আক্রমণ। কলেজ কর্তৃপক্ষ যখন তাঁকে ছাঁটাই করতে বদ্ধ পরিকর হলেন সেই সংবাদ জেনে পদত্যাগপত্রের সঙ্গে উইলসনকে ডিরোজিও একটি চিঠি লেখেন (২৬ এপ্রিল ১৮৩১)। এই চিঠির মধ্যে ধরা পড়েছে ডিরোজিওর পরিণত ব্যক্তিত্বের পরাকাষ্ঠা, তাঁর চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, তাঁর চিন্তার শৃঙ্খলা, তাঁর সংযত, সংহত, সুধীর, অকম্প্র, সুভদ্র রূপটি। বেদনা তরঙ্গিত হৃদয়ের সমুদ্রে সমুন্নত জমাট শিলামূর্তির মতো স্থির। একতরফা আক্রমণ ও পদচ্যুতির বেদনাঘন মুহূর্তেও তিনি ক্রোধের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হননি। ২৫ এপ্রিল, ১৮৩১ তারিখেও একটি চিঠি লেখেন উইলসনকে—

> আপনার উপদেশের জন্য আমি সর্বান্তঃকরণে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ যে ক্ষতের নিরাময় নেই সেই ক্ষতে আপনি সহৃদয় স্পর্শের প্রলেপ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু যে গুণ আমার নেই আমি অকারণ তার দাবিদার হতে চাই না। আমার পদচ্যুতি যদি জ্ঞানীগুণীদের দ্বারা অনুমোদিত হয়, তার বেদনা আমাকে সইতেই হবে।[৪৩]

ম্যাকনাটেন নামের এক মিলিটারী অফিসার তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশিত এক সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে ডিরোজিওর প্রেসে চড়াও হয়ে তাকে বেত্রাঘাত করেন। তাতে গোটা কলকাতার পত্রপত্রিকায় ধুন্ধুমার বাদানুবাদ বেধে যায়। বক্তব্য-প্রতিবক্তব্য চলতে থাকে। স্বয়ং ডিরোজিও সেই বাদানুবাদে ইতি টানেন যে লেখাটি লিখে, তার শেষ ছত্রটি উদ্ধার করছি—

> I withdraw myself from the scene...I abandon him to his own reflection and the charity of the public.[৪৪]

এ লেখা সুপরিণত 'জেন্টলম্যান'-এর। ডিরোজিও কোনো একমাত্রিক মানুষ ছিলেন না, ছিলেন দ্বিমাত্রিক মানুষ। তাঁর ছাত্রদের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, তাঁরা এমন একজনের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে এসেছিলেন, যিনি একই সঙ্গে 'ক্রিটিক্যালম্যান' এবং 'জেন্টলম্যান'।

কোন পথে গেল জ্ঞান

॥ পনেরো ॥ অভিভাবকেরা চান ছেলেরা বিধিমতে 'লক্ষ্মী ছেলে' হয়ে বের হোক মাস্টারের শিক্ষা-কল থেকে। শিক্ষকেরা সেই মতো 'কেরিয়ারিস্ট' ছাত্রের সংখ্যা দিয়েই তাদের সাফল্য গণনা করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এতাদৃশ আত্মসুখপরায়ণ একান্ত ব্যক্তিগত ছাত্রদের কাছ থেকে দেশ বা সমাজের বিশেষ কিছু পাবার থাকে না। সেজন্য ফরাসি দেশে একটা কথা চালু আছে—'France was saved by her deserters'। স্কুল পালানো ছেলেরাই ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর-সম্পর্কিত একটি লেখায় সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছিলেন,

> সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভালো চাকরি-বাকরি ও বিবাহ কালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্টু ও অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক কিছু আশা করা যায়।[৪৫]

'ইয়ংবেঙ্গল'-রা একদিক থেকে ইতিহাসের বিচারে 'লক্ষ্মী ছাড়া'-র দলেই পড়ে। রবীন্দ্রনাথ যাদের 'দুষ্টু অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলি' বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর বিচারে বিদ্যাসাগর ও চৈতন্যদেবের বাল্যকাল ঠিক বিদ্যাসাগর-বর্ণিত গোপাল মাফিক ছিল না, রাখালের সঙ্গে তাদের মিল দেখা যেত। ইয়ংবেঙ্গলরা তো ফুলের গাছকেও তর্কের শিং দিয়ে গুঁতিয়েছে। কিন্তু দেশ ও সমাজ তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখরা সব ইতিহাস প্রসিদ্ধ মানুষ হয়ে গেছেন। তার কারণ তাঁদের শিক্ষাগুরু ছিলেন ডিরোজিও। কি শিখিয়েছিলেন ডিরোজিও তাঁদের? পথ চলার কোন্ দিশা দেখিয়ে দিয়েছিলেন? ছাত্রদের কাছে দেওয়া তাঁর একটি ভাষণের কথা উল্লেখ করবো—

> My advice to you is, that you go forth into the world strong in wisdom and in worth ; scatter the seeds of love among mankind.[৪৬]

জ্ঞানে এবং সক্রিয়তায় তোমরা সমৃদ্ধ হয়েছো; এখন বিশ্বমাঝে নিজেদের বিকীর্ণ করো এবং মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে দাও ভালোবাসার বীজ।

সামাজিক দায়বদ্ধতার এই দীক্ষা তিনি ছাত্রদের দিয়েছিলেন বলেই ছাত্ররা বিস্মৃত হননি তাঁদের দায়িত্ব। সে তুলনায় এখনকার অবস্থা কহতব্য নয়। অভিভাবকেরা তো আগেই চম্পট দিয়েছেন এই পথ থেকে, ভালো শিক্ষকেরাও হিসেব কষে যোগ দিয়েছেন জয়েন্ট পরীক্ষার কোচিং-এ। ডিরোজিও এখন দূরের নক্ষত্র।

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা

॥ ষোলো ॥ শিক্ষক ডিরোজিও সম্পর্কে আলোচনার ষোলো কলা পূর্ণ করি একটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রবীণ, নগরবৃদ্ধ, বিত্তশালীদের দ্বারা পরিচালিত 'বেঙ্গল' ডিরোজিওর শিক্ষকতার সৌজন্যে প্রথম 'ইয়ং'দের হাতে আসে। বঙ্গীয় সমাজ-সংস্কৃতিতে এর ফলে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায়। দেশ ও দশের কি করে ভালো হবে সে ব্যাপারে শেষ কথা বলার অধিকারী ছিলেন পক্ককেশ, ইন্দ্রলুপ্ত, বলীরেখাবহুল মহাবৃদ্ধেরা। ছেলে-ছোকরাদের সে ব্যাপারে বলার কিছু থাকতেই পারে না। এদেশে ডিরোজিওই প্রথম মাস্টার এবং মানুষ এবং ক্রান্তদর্শী কবি, যিনি বললেন,

> Your hand is on the helm–guide on young men.[৪৭]

ডিরোজিও নিজে ছিলেন তরুণ। তাঁর ছাত্ররা উঠতি তরুণ। তিনি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করলেন বিকচমান তরুণদের উপর। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে তরুণ ছাত্ররা তাদের ভাবনা চিন্তা, বক্তৃতা, বিতর্ক, পত্রপত্রিকা, লেখনী চালনা ও সামাজিক সক্রিয়তা দিয়ে গোটা সমাজকে নাড়িয়ে দিলেন। আর সেই থেকেই শুরু হলো বঙ্গসংস্কৃতিতে তারুণ্যের জয়গান।[৪৮] রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুল, বিবেকানন্দ থেকে সুভাষচন্দ্র, ক্ষুদিরাম থেকে সুকান্ত যৌবন যেন লহ লহ করে

উঠলো। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এ-মুড়ো ও-মুড়ো চোখ চালিয়ে দেখবেন তা কখনোই 'ইয়ং'-দের হাত ছাড়া হয়নি। ডিরোজিও তাঁর শিক্ষা দিয়ে, মৃত্যু দিয়ে চিরকালের জন্য না হলেও অনেককালের জন্য বাঙালির বয়ঃসীমা বেঁধে দিয়ে গেছেন। বাঙালির মনের বয়স আজও বাইশ ছাড়ায় নি। বস্তুত পক্ষে বঙ্গসংস্কৃতিতে এটাই শিক্ষক ডিরোজিওর শ্রেষ্ঠ দান। তাঁর কল্যাণে 'বেঙ্গল' এখনও 'ইয়ং'।

উৎসসূত্র ও সহায়ক টীকা :

১. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, *কলকাতার আদি আচার্য ডেভিড ড্রামন্ড, Teacher of Derozio,* ডিরোজিও স্মরণ সমিতি, পুনশ্চ, কলকাতা-৭০০০০৯, ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৪

২. ——, *ডিরোজিও : রুটিন-ভাঙা এক মাস্টার,* পুনশ্চ, এপ্রিল, ২০০৯

৩. T. Edwards, *Henry Derozio, The Eurasian Poet, Teacher and Journalist*, (1884), Riddhi ed, 1980, p. 2

৪. হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দু কলেজে ৪র্থ শিক্ষকের পদে যোগ দিয়েছিলেন সম্ভবত ১৮২৬ সালের নভেম্বর (মে?) মাসে ১৫০ টাকা বেতনে। ১৮৩১ সালের ২৩ এপ্রিল (শনিবার) পরিচালন সমিতির মিটিং-এ তাঁকে পদত্যাগ করতে বলার সিদ্ধান্ত হয়। ২৫ এপ্রিল ডিরোজিও পদত্যাগপত্র পাঠান।

৫. শ.মু., 'সমাজের নাম ইস্ট ইন্ডিয়ান : কবির নাম ডিরোজিও', *ইতিহাস-অনুসন্ধান*-১৭, ফার্মা কে.এল.এম.প্রা.লি., পৃ. ৫১৪-৫২১; Noel P. Gist and Roy Dean Wright, *Marginality and Identity,* Lieden, 1973, p. 150

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিশ্বভারতী', *রবীন্দ্র রচনাবলী,* ১৪শ খন্ড, প.ব. সরকার, পৃ. ৫০২

৭. ——, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', *প্রভাত সংগীত, সঞ্চয়িতা* (১৩৩৮), দশম সং (১৩৮৯), পৃ. ৩৬-৩৭

৮. 'Conversazione' মানে সান্ধ্য-বিদ্বৎসভা। টমাস এডওয়ার্ডস লিখেছেন, এই সভা ডিরোজিওর উদ্যোগে কলেজ ছুটি হওয়ার পর বসতো কলেজ চত্বরেই। –T. Edwards, *Henry Derozio, The Eurasion Poet, Teacher and Journalist*, pp 66-67

৯. Sushobhan Sarkar, *On the Bengal Renaissance*, Papyrus edition, Calcutta, 1979

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মায়ার খেলা, গীতবিতান,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, চৈত্র ১৩৮৬ সং, পৃ. ৯১৭

১১. C.J. Montegue (?), 'Henry Louis Vivian Derozio', ''Oriental Magazine'', Vol-1, No. 10, 1843; rpt. *Derozio Remembered*, Birth Bicenterary Celebration Volume, Compiled and edited by Sakti Sadhan Mukhopadhyay, DCC, 2008, p. 80

১২. H.L.V. Derozio, 'Acknowledgement of Errors', ''Calcutta Literary Gazette'', January 3, 1835, Thoughts on Various Subjects; rpt. *Song of the Stormy Petrel,* eds. A.M, A.D, A.K & SSM, DCC, Progressive Publishers, Cal-73, p. 307

১৩. বিবেকানন্দের বহু পরিচিত উদ্ধৃতি। ইংলণ্ডে শিক্ষা সংক্রান্ত এক বক্তৃতায় বলেন এটি।

১৪. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (১৯০৩), ১৯৫৭ সং। হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাদের 'উৎকৃষ্ট ফল' বলা হয়েছে।

১৫. T. Edwards, *Ibid*, p. 9

১৬. ১১নং টীকা দ্রষ্টব্য

১৭. ''Calcutta Gazette'', December 25,1817, Annual Exam. of 1817; rpt. *কলকাতার আদি আচার্য ডেভিড ড্রামন্ড,* তদেব, পৃ. ২০০

১৮. ''Calcutta Journal'', 24 December, 1821, Annual Exam. of 1821; rpt. *কলকাতার আদি আচার্য ডেভিড ড্রামন্ড,* পৃ. ২১২

১৯. ''Calcutta Journal'', 24 December, 1822, Annual Exam. of 1822; rpt. *কলকাতার আদি আচার্য,* পৃ. ২১৪

২০. ''Calcutta Literary Gazette'', Nov. 10, 1833, rpt. ''Bengal Hurkaru'', Nov. 12, 1833; *কলকাতার আদি আচার্য,* পৃ. ৪৪

২১. 'A Brief Memoir of the Late Mr. David Drummond', ''Oriental Magazine'', Vol. 1, No.6, June, 1843; rpt. *কলকাতার আদি আচার্য, ডেভিড ড্রামণ্ড,* পৃ. ১৪৭

২২. ''Calcutta Gazette'', September 20, 1830, 'Anglo-Hindoo Poetry' নামে একটি লেখায় বলা হয়, 'Kasiprasad Ghosh, who is one of the Alumni of the Hindoo College.'

২৩. শ. মু., 'হরচন্দ্র ঘোষ : সরশুনার ইয়ংবেঙ্গল', *যদি চিনি যদি জানিবারে পাই* (ডিরোজিও সম্পর্কিত প্রবন্ধ সংকলন), গ্রন্থমিত্র, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৮৭-২৯৯

২৪. 'Sonnet to the Pupils of Hindoo College', ''Kaleidoscope'', No. 1; August, 1829; rpt. *Bengal : Early Nineteenth Century*, ed Gautam Chattopadhyay, Research India Publications, Calcutta, June, 1978, p. 5

২৫. Baboo Kissory Chand Mittra, 'The Hindoo College and its Founder', (The Lecture deliveved on 2 June, 1861) ; rpt. *Derozio Remembered*, p. 148

২৬. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* তদেব, পৃ. ৮৫

২৭. T. Edwards, *Ibid,* pp. 66-67; অনূদিত উদ্ধৃতি *ডিরোজিও : রুটিন-ভাঙা এক মাস্টার,* পৃ. ২১

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান,* তদেব, প্রেম, ৩৫ সংখ্যক গান, পৃ. ২৮৪

২৯. ''সংবাদ রত্নাকর'', ২৪ পৌষ ১২৩৮; উদ্ধৃত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *সংবাদপত্রে সেকালের কথা,* ২য় খণ্ড, ১৮৩০-১৮৪০, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪০; rpt. *Derozio Remembered,* pp. 13-14

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান,* পূজা, ৬৮ সংখ্যক গান, পৃ. ৩৪

৩১. ২৪ সংখ্যক টীকা; rpt. *Song of the Stormy Petrel,* Ibid, p. 245

৩২. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* পৃ. ৮৫

৩৩. R.C. Ghosha, *A Biographical Sketch of the (Rev) K.M. Banerjee* (1893), Progressive Publishers, Calcutta-73, 1980, p. 8

৩৪. ৩২নং টীকা দ্রষ্টব্য

৩৫. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, *অক্ষয় চরিত,* কলিকাতা, ভাদ্র ১২৯৪, পুনর্মুদ্রিত 'এক্ষণ' নবম বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৭৮, পৃ. ৪৭। অক্ষয়কুমার দত্তকে উদ্দেশ্য করে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখা পদ্য।

৩৬. *Song of the Stormy Petrel,* Ibid, I. Correspondence Related with Removal of Derozio, Letter of H.L.V. Derozio to H.H. Wilson, pp. 335-338; *যদি চিনি যদি জানিবারে পাই,* 'ডিরোজিওর চিঠি : রেনেসাঁসের সোনার তরবারি।' [অনুবাদ আমার] পৃ. ২২৪-২৩৫

৩৭. H.L.V. Derozio, 'Maxims at Variance with Human Conduct', Thoughts on Various Subjects, ''Calcutta Literary Gazette.'' 15th December, 1834; rpt. Rosinka Chaudhuri ed., *Derozio, Poet of India,* Oxford University Press, 2008, p. 382

৩৮. লরেঞ্জো ভাল্লা (১৪০৫-১৪৫৭), 'অন ডোনেশন অব কনস্টানটাইন' (১৪৪০) নামক ট্রিটিজে তিনি পোপের পার্থিব রাজত্বের ভিত্তিটাই খসিয়ে দিয়েছিলেন।

৩৯. বলদাসর কাস্তিলিওনে (১৪৭৮-১৫২৯), *কোর্টিয়ার* (১৫২৮) তাঁর বিখ্যাত রচনা। উরবিনোর রাজসভায় আসীন ছিলেন তিনি।

৪০. H.L.V. Derozio, 'Cause and Effect', Thoughts on Various Subject, ''Calcutta Literary Gazette'', 13th December, 1834; rpt. Rosinka Chaudhuri, *Derozio, Poet of India,* pp. 377-378

৪১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *ধর্ম্মতত্ত্ব, বঙ্কিম রচনাবলী,* প্রবন্ধ খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ. ৮৩৩

৪২. ১১নং উল্লেখ দ্রষ্টব্য

৪৩. ৩৬নং উল্লেখ দ্রষ্টব্য

৪৪. *Song of the Stormy Petrel,* II. Correspondences related with Assault on Derozio, 20th Sept. to 27th Sept., 1831, pp 343-362, page-362

৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিদ্যাসাগর চরিত', *চারিত্র পূজা, রবীন্দ্র রচনাবলী,* ১১শ খণ্ড, প.ব. সং, ১৯৮৯, পৃ. ১৭৮

৪৬. H.L.V. Derozio, 'Conclusion of My Address to My Students Before the Grand Vacation in 1829', Thoughts on Various Subjects, ''Cal. Lit. Gaz.'', Jan. 3, 1835; rpt. *Song of the Stormy Petrel,* Ibid, p. 309

৪৭. Sonnet (who originated and carried into effect the proposal for procuring a portrait of David Hare), written on March 8, 1830

৪৮. শ.মু., *ডিরোজিও : রুটিন-ভাঙা এক মাস্টার,* তদেব, ভূমিকাংশ।

মধুসূদনের শিক্ষা : শিক্ষায় মধুসূদন

অভ্র বসু

উনবিংশ শতাব্দী বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তরের কাল—যে-যুগান্তরকে সম্ভব করে তুলেছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সংযোগের অভিঘাত। পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাবসঞ্জাত যে-নবচেতনার উন্মেষ এদেশে লক্ষ্য করা গেল, তার গতিপ্রকৃতি ছিল বিচিত্র ও বিবিধ। একদিকে অতি-আধুনিকতা, অন্যদিকে চরম রক্ষণশীলতা—এই ব্যাপ্ত পরিসরে বহু মনীষী তাঁদের মতো করে অন্বেষণ করেছেন সত্তার সংজ্ঞা। অনেক স্ববিরোধ ও অসংগতির মধ্যেই অন্তঃশীলা থেকেছে একটি সংশ্লেষের চেষ্টাও। ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অজস্র সংঘাতের মধ্যে দিয়েই একটি সমন্বয়ের সাধনা চলেছে।

উনিশ শতকের ইতিহাস বাংলায় বিচিত্রমুখী—বাঙালি মনীষা সমকালের নতুন দৃষ্টি-কোণকে নানাভাবে গ্রহণ করেছে এবং প্রকাশ করেছে। কিন্তু তার প্রভাব সকলের উপর সমানভাবে পড়েনি। এই সময়ে মধুসূদনের মতো মানুষ যেমন ইংরেজিয়ানায় বিলক্ষণ আপ্লুত হয়েছেন, তখনই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো মানুষ আকৃষ্ট হয়েছেন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি। মধুসূদনের মতো পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিত এবং শিক্ষার ধরন সেযুগের বহু মানুষেরই ছিল, কিন্তু মধুসূদনের মতো এত বেহিসেবি জীবন কারো হয়নি। বস্তুত বাংলাসাহিত্যে মধুসূদনের ভূমিকা যেমন আকস্মিক, তাঁর জীবনও তেমনি আদ্যন্ত অসংগত; তাঁর জীবনের প্রধান সংগতিই সেটি। তিনি consistently inconsistant। মধুসূদনের সমগ্র জীবনে তাঁর শিক্ষানবিশি পর্ব কীভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে, তা স্বভাবতই কৌতূহল জাগায়। আবার নিজের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে মধুসূদন ছিলেন শিক্ষক—যদিও সেই পেশায় তিনি দীর্ঘদিন আবদ্ধ থাকেননি—নতুনতর সম্ভাবনার দিকে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে মধুসূদনের জীবনতথ্যের আলোকে এই শিক্ষা, শিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে মধুসূদনের অভিজ্ঞতা, অভিরুচি এবং অভিমত কীরকম ছিল, তার একটি রূপরেখা আঁকবার চেষ্টা করব।

দুই.

উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষার ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান নিশ্চয়ই হিন্দু কলেজ (১৮১৭)। এদেশি ছাত্রদের জন্য পাশ্চাত্য রীতির শিক্ষার এটিই ছিল প্রধান কেন্দ্র। আর পাঁচটি বাঙালির মতোই মধুসূদন ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। অবশ্য হিন্দু কলেজের আগে মধুসূদন অন্য কোনো একটি স্কুলে পড়েছিলেন। মধুসূদনের শিক্ষার সূত্রপাত মায়ের কাছে। তাঁর মা জাহ্নবী দেবী শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। তাঁর শিক্ষার মাত্রা ঠিক কতটা ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু মধুসূদনকে রামায়ণ-মহাভারতাদি পড়ানোর ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল। প্রসঙ্গত, মধুসূদনের প্রথম প্রবন্ধটি নারীশিক্ষা বিষয়ক। মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন ফারসি শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি সামান্য অবস্থা থেকে সমাজে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নেন মূলত ফারসি শিক্ষার জোরে। ব্যবহারিক কারণে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ফারসি